সূচীপত্র

Download
Full Edition
at
Rs. 50/-
only

পাঠকের চোখে ৫
সুন্দরবনের নদী তার হারানো জমি ফেরত চাইছে ঃ কল্যাণ রুদ্র ৭
ইতিহাসের খোঁজে সুন্দরবনে ঃ নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ১০
আত্মহত্যা-প্রবণ সুন্দরবন ঃ সৌমেন দত্ত ১৪
সাতজেলিয়ার কাঁকড়া শিকারি ঃ শঙ্কর কুমার প্রামাণিক ১৫
পেট চালাতে জঙ্গলই ভরসা ঃ কালিপদ মৃধা ২২
সুন্দরবনে মোরগ লড়াই ঃ সুভাষ মিস্ত্রী ২৬
জল জঙ্গল এবং বন কেটে বসত ঃ মনোজ বসুর দুটি উপন্যাস ঃ দিব্যেন্দু ঘোষ ২৯
পর্যটনে সুন্দরবন ঃ সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ সৌরেন ভট্টাচার্য ৩১
বদ্বীপের রকমফের ঃ মিত্রজিৎ চ্যাটার্জী ৩৩

ধারাবাহিক আত্মকথা
আমার জীবন আমার সুন্দরবন ঃ তুষার কাঞ্জিলাল ১৯

প্রতিবারের পাতা
সুন্দরবনের উদ্ভিদ ঃ জাত গরান ঃ সৌমিক মিত্র ৩৫
সুন্দরবনের প্রাণী ঃ ভোঁদড় ঃ শুভদীপ অধিকারী ৩৬
সিনেমায় সুন্দরবন ঃ অমানুষ ঃ অজয় কোনার ৩৮
সুন্দরবনের বই ঃ অমিতাভ ঘোষের হাঙরী টাইড ঃ সুমিতা ব্যানার্জী ৩৯
সুন্দরবনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ঃ টেগোর সোসাইটি ঃ শ্যামাপদ রায় ৪০
সুন্দরবনের মেলা ঃ পীর গোরাচাঁদের মেলা ঃ শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য ৪১
সুন্দরবনের পত্রিকা ঃ অগোছালো এক পরিশ্রমী প্রয়াস ঃ জয় পত্রনবিস ৪২

সুন্দরবন ঃ ঘটনাপঞ্জী (১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০১০) ৪৩

নামাঙ্কন ঃ দেবব্রত ঘোষ।
প্রচ্ছদ ঃ ধৃতিমান মুখার্জী
সূচীপত্রের ছবি ঃ নীলাদ্রি সরকার

নদীখাতে পলি সঞ্চয়ের ফলে নদী উপরে গ্রাম নিচে। ছবি ঃ অজয় কোনার

সুন্দরবনের নদী তার হারানো জমি ফেরত চাইছে

কল্যাণ রুদ্র

২০০৯ সালের ২৫শে মে সুন্দরবনের ওপর ভয়ঙ্কর ঘূর্ণীঝড় আইলা ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ সাময়িকভাবে গৃহহীন হন। কত মানুষ মারা গিয়েছিলেন তার হিসাব নেই। সংখ্যাটা তিনশ হতে পারে তার অনেক বেশিও হতে পারে। সেই সময় একদিন সকালে আমাকে মহাশ্বেতা দেবী ফোন করেন। ফোনে বললেন কি করছ? তখন সকাল সাড়ে আটটা। আমি বললাম দিদি একটা বই পড়ছি। উনি বললেন বইটা বন্ধ করে রাখ। এখন বই পাড়ার সময় নয়। সুন্দরবনের এত মানুষ বিপন্ন ওদের জন্য কিছু করতে হবে। তারপর থেকে মূলত দিদির উদ্যোগে আমরা বেশ কয়েক জন বন্ধু বান্ধব মিলে বেশ কয়েকবার সুন্দরবনে গেছি এবং ওই মানুষদের কাছে সামান্য কিছু বেঁচে থাকার উপকরণ পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছি। তীব্র জল কষ্ট, খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা।

আমরা কুমিরমারি বলে একটি গ্রামে আইলার কয়েক দিন পরে পৌঁছেছিলাম। সেই অভিজ্ঞতার কথা শুরুতে উল্লেখ করি। সামান্য কিছু ত্রাণের জিনিসপত্র নিয়ে আমরা কুমিরমারি গ্রামে পৌঁছেছি। যারা নিতে এসেছেন তারা মূলত শিশু এবং কিছু বৃদ্ধ মানুষ। কিছু ক্ষণ চলার পর আমি একজন বয়স্ক মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম সব শিশুরা লাইনে দাঁড়িয়েছে, পুরুষেরা কোথায়? বৃদ্ধ বললেন পুরুষেরা সব চলে গেছে গ্রাম ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে কলকাতা বা অন্যত্র। বললাম তাহলে মায়েরা কোথায়? বললেন বৃদ্ধ মায়েরা অনেকে আছেন কিন্তু তারা এখন আসতে পারবে না। আমি বললাম কেন? বললেন যখন আইলা হয় তখন ওরা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই কোন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং যখন কয়েকদিন পর ফিরে আসে তখন তাদের সমস্ত ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে। ওদের একটাই কাপড়। স্নানের সময় সেই কাপড় ধুয়ে শুকোতে দিয়েছে। মায়েরা এখন তাই কেউ আসতে পারবে না। আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর শিহরণ খেলে গেল,আমার সমস্ত নাগরিক সভ্যতা যেন একটি থাপ্পড় মারল আমার গালে। একজন মানুষ যাকে আমরা চলতি কথায় আদিবাসী বলি

ইতিহাসের খোঁজে সুন্দরবনে

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বোড়ালে প্রাপ্ত যক্ষিণী মূর্তি

আজকাল অনেকেই সুন্দরবনে বেড়াতে যান। সরকারী পর্যটন দপ্তর বা বেসরকারি ভ্রমণ সংস্থার ব্যবস্থাপনায়। এসব পর্যটকদের কাছে পৃথিবীর এই বৃহত্তম বাদাবনের মূল আকর্ষণ সুন্দরী-গরান, গোলপাতার বনবাদাড়, অসংখ্য নদীনালায় জোয়ার-ভাঁটার খেলা, ব্যাঘ্র-প্রকল্প, কুমীর-প্রকল্প, পক্ষী-নিলয় ও দিনের শেষে বনবাংলোতে আমোদ-প্রমোদে রাত্রি যাপন। কিন্তু এসব ভ্রমণ পিপাসু মানুষ ছাড়াও আরও একদল লোক বহুদিন ধরে সুন্দরবনের গভীরে, আনাচে কানাচে, ঘুরে বেড়ান ভিন্ন এক আকর্ষণে। ইতিহাসের খোঁজে। এঁদের অনেকেই সুন্দরবনকে চেনেন নিজের হাতের তালুর মত। খোঁজার নেশায় কখন সখনও এঁদের জীবনও বিপন্ন হয়। এক সময়ে এঁদের প্রচেষ্টাকে অনেকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন। দু-একজন বাঘাপণ্ডিত এঁদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতেও ছাড়েন নি। এ বিষয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে।

ভদ্রলোকের ঠিকানা জানা ছিল না। তবে কলকাতার কোন্ পাড়ায় থাকেন তা জানা গেল। নামীদামি মানুষ। তাই বাড়ি খুঁজে পেতে বেশি বেগ পেতে হল না। দোতালার ঘরে এক ফালি গালিচার ওপর আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে ছিলেন। ঘরের দু দিকের দেয়ালে কাঠের র‍্যাকে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত শুধু বই, আর বই। চশমার ফাঁক দিয়ে নিবিড়ভাবে আগন্তুককে একবার দেখে নিলেন। পরিচয় জানার পর মন দিয়ে সব কথা শুনলেন। তারপর ঝোলা-বন্দি পুরাবস্তুগুলি গভীরভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পালা। এগুলির মধ্যে ছিল মধ্যপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগের বেশ কয়েকটি পাথরের হাতিয়ার, চার-পাঁচটি তামার তৈরি মিশরীয়স্কারাব মাদুলি বা 'চার্ম', দু'তিনটি প্রাচীন লিডিয়ার স্বর্ণমুদ্রা এবং এক গাদা 'নর্দান ব্ল্যাক পলিষ্ট ওয়্যার' ও 'রুলেটেড ওয়্যার'-এর খোলাম কুঁচি। এসবই উদ্ধার করা হয়েছিল ডায়মন্ডহারবারের প্রায় লাগোয়া সাবেক সুন্দরবনের দেউলপোতা ঢিবি থেকে। সব ভাল করে দেখে নিয়ে ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন, 'সবই জেনুইন, কোনটাই ফেক্ নয়'। তারপর হঠাৎ অবিশ্বাসের স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না এ হতে পারে না। সুন্দরবনের আবার পুরাতত্ত্ব! প্রি-হিস্ট্রি! ওতো পলিমাটির জলা-জঙ্গল। বাঘ-সাপ-কুমীরের আস্তানা। আর ওসব কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসগুলো ভাঁটার টানে নদীর অনেক ওপর থেকে এসে খাড়িতে জমেছে।'

ভদ্রলোক বিদগ্ধ পুরাবিৎ। দেশের এক কালের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগের পঠন-পাঠন ও গবেষণা পরিচালনা করেছেন। এমনকি তক্ষশীলা ও আরিকামেডুতে উৎখনন কাজে স্যর মর্টিমার হুইলারের সহকর্মী ছিলেন। তাছাড়া প্রাচীন বাংলার এক অবলুপ্ত রাজধানী ও বৌদ্ধ বিহারের আবিষ্কারের মত সাড়া জাগানো গৌরবও তাঁর আছে। তাই তর্ক করা চলে না। তবে সেদিন বিস্মিত হইনি। কারণ, যাঁরা কেতাবি প্রত্নচর্চা করেন বা সুন্দরবনে কখন সখনও মোটরবোটে চেপে বেড়াতে যান, কিন্তু কখনও জীবন বিপন্ন করে পায়ে হেঁটে বনের গভীরে প্রবেশ করেন

সাতজেলিয়ার কাঁকড়া শিকারি

শঙ্কর কুমার প্রামাণিক

সুন্দরবনের মোট ১০২ দ্বীপের মধ্যে জঙ্গল হাসিল করে ৫৪টা দ্বীপে মানুষ বাস করছে। ১৫টা থানা আর ১৯টা ব্লক সুন্দরবনের মধ্যে পড়ে। ১৯টা ব্লকের মধ্যে গোসাবা ব্লকেই আছে ১১টা দ্বীপ। সাতজেলিয়া তার অন্যতম। সবার শেষে এই দ্বীপের জঙ্গল হাসিল হয়েছে। সাতজেলিয়া দ্বীপটি হ্যামিলটন সাহেবের জমিদারির অংশ। এর পশ্চিমে গোসাবা, পুবে রাঙাবেলিয়া, উত্তরে মোল্লাখালি এবং দক্ষিণে সজনেখালি। এই দ্বীপে আছে দুটো গ্রাম পঞ্চায়েত - সাতজেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত ও লাহিড়ীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় সাতজেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁকড়া শিকারির দল। সেই আলোচনায় আগে সাতজেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হওয়া দরকার। সে কারণে ঐ অঞ্চল সম্পর্কে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ করা হল। তিনটে মৌজা নিয়ে এই অঞ্চল। মৌজা তিনটে হলেও, গ্রাম কিন্তু ছ'টা। শোনা যায় হ্যামিলটন সাহেব তাঁর পরিবারের সদস্যদের এবং জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারীদের নামানুসারে গ্রামগুলোর নামকরণ করেছিলেন।

মৌজা	গ্রাম	
১। সাতজেলিয়া	১। সুকুমারী	৪। মিত্রবাড়ি
২। দয়াপুর	২। এমিলিবাড়ি	৫। আনন্দপুর
৩। সুধাংশুপুর	৩। দয়াপুর	৬। সুধাংশুপুর

এক নজরে সাতজেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ-

মোট আয়তন - ২৩ বর্গমাইল।
মোট পরিবার - ৩,৩০৪টি।
মোট লোক সংখ্যা - ১৭১৮৪ জন
পুরুষ- ৮,৮১৮ জন।
মহিলা - ৮,৩৬৬ জন।
তপসিলি জাতি - ১১,৭২১ জন।
তপসিলি উপজাতি - ৩,২২৭ জন।
অন্যান্য - ২,২৩৬ জন।
প্রাথমিক বিদ্যালয় - ১৩টি।
উচ্চ বিদ্যালয় - ৪টি।
উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র - ৪টি।
আই.সি.ডি.এস - ৩৫টি।
নলকূপের সংখ্যা - ৪০টি।
এস.এইচ.জি- ৭৮টি।
স্বনির্ভর গ্রুপ -১৫৮টি
বি.পি.এল ভুক্ত পরিবার - ৮১৩টি
খাল - ১২টি
বাজার - ২টি
নদী বাঁধের দৈর্ঘ্য - সাড়ে সতেরো কি.মি।
কৃষি জমির পরিমাণ - ৪,০৭৯ একর

বিঃ দ্রঃ- ১। উপরোক্ত তথ্যসমূহ সাতজেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে সংগৃহীত। ২। পরিবারের সংখ্যা ও লোক সংখ্যা ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী।

আমার জীবন আমার সুন্দরবন

ধারাবাহিক আত্মকথা

তুষার কাঞ্জিলাল

চল্লিশ বছর সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়া গ্রামে থেকে শিক্ষকতা করেছেন। আজকের সুন্দরবনের উন্নয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। গল্পে, উপন্যাসে তাঁর কর্মকান্ডের কথা উঠে এসেছে বারবার। কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর কাজের পরিধি বেড়েছে আরও। পেয়েছেন 'জাতীয় শিক্ষক' এবং 'পদ্মশ্রী'র মত জাতীয় সম্মান। এখনও সুন্দবনের উন্নয়নের কাজে নিরলস। সুন্দরবন-অন্ত প্রাণ মানুষটির আত্মকথা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে পেরে 'শুধু সুন্দরবন' সম্মানিত। - সম্পাদক।

আমার শৈশব? একটি ওপার বাংলার আর একটি এপার বাংলার স্মৃতি। আমার বাবা দেশভাগ হওয়ার অনেক আগে থেকে এখনকার পশ্চিমবঙ্গে সরকারী চাকরী করতেন। কাজেই আমি কখনো বাংলাদেশে দেশের বাড়িতে থেকেছি, আবার কখনো ঘুরেছি বাবার চাকরী যায়গায়।

আমাদের দেশ ছিল এখনকার বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার সোনাইবুড়ি নামে গ্রামে। সেটা লাক্সারীপুর থেকে নোয়াখালি যাওয়ার ট্রেন রাস্তায়। আমাদের পূর্ব পুরুষ বোধহয় মিথিলা থেকে এসেছিলেন। কাঞ্জিলাল এই পদবিটা তো সাধারণত খুব বেশি দেখা যায় না! যতটা আমি শুনেছি, সেটা সম্পূর্ণ ঠিক কিনা আমি জানি না। মিথিলার কাঞ্জিবিল্ব গ্রাম থেকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা জমিদারের দেওয়ান হয়ে এই গ্রামে এসেছিলেন। সেজন্য আমাদের বাড়িটাকে বলা হত দেওয়ানজির বাড়ি, পরবর্তী কালে একটা সময়ে আমার পূর্ব পুরুষেরা সেই জমিদারী কিনে নেন। আবার দু-তিন পুরুষের মধ্যে সেটা উড়িয়েও দেন, কাজেই জমিদার বলতে যে বৈভব, ঐশ্বর্য তার কোনটাই আমি দেখিনি। কারণ তার কিছুই ছিল না। আমার জন্মের সময় আমাদের অবস্থা প্রকৃত অর্থে দরিদ্রই বলা যায়। কারণ আমাদের তখন কোন জমি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে কাঞ্জিলাল পদবিটা আমরা পরে নিই। ঠাকুরদার আমল পর্যন্ত আমাদের পদবি ছিল দেওয়ানজি। আমার এক জ্ঞাতি দাদু নোয়াখালিতে খুব বিখ্যাত উকিল ছিলেন, তখনকার দিনে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি পদবীটা পাল্টে কাঞ্জিলাল করেন। আমার বাবার নাম ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল। মা ছিলেন শোভারাণী কাঞ্জিলাল। আমার ঠাকুমা আমাকে খুব ভালবাসতেন। বাবা মা থাকতেন এদিকে আমি শৈশবের বেশির ভাগ সময় কাটাতাম নোয়াখালিতে ঠাকুমার কাছে। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আমি বেশির ভাগ সময় বাংলাদেশেই কাটিয়েছি। অবশ্য বেশ কয়েকবার যাতায়াতও করেছি।

আমার জীবনে যাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশি এবং যিনি আমার চরিত্রের কিছু কিছু দিক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন তিনি আমার ঠাকুমা। ঠাকুমা সেকেলে লোক হলেও প্রায় সংস্কার মুক্ত ছিলেন। আমাদের বাড়িতে পূজো-আচ্চা বা ব্রত পালন এসব কোন ব্যাপার ছিলনা, লক্ষী পূজো প্রতি বৃহস্পতিবার করতে হয়, আমি কোনো দিন দেখিনি। কারণ আমার ঠাকুমা এগুলো বিশ্বাস করতেন না। সেই যুগে এরকম প্রগতিশীল এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহিলা আমি পরবর্তীকালে আর দেখিনি।

অতি বাল্য বয়সে ঠাকুমার সাহচর্য এবং কাছ থেকে দেখা আমার ওপরে প্রভাব ফেলে। পরবর্তী জীবনে বুঝতে পেরেছি তিনি কত উদার ছিলেন।

ছেচল্লিশ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার পরে আমি পাকাপাকি ভাবে এই দিকে চলে আসি। দাঙ্গার এক ভয়ঙ্কর স্মৃতি আমার আছে। তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। কয়েক পুরুষ ধরে মুসলমান অধ্যুষিত নোয়াখালিতে আমাদের পরিবার ছিল। কিন্তু মুসলমানদের সাথে সেই অর্থে প্রচণ্ড মত বিরোধ বা দাঙ্গা হতে পারে তার আগে পর্যন্ত বুঝিনি। বরং ছেলেবেলায় দেখেছি বর্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবারে দু'তিন জন মুসলমান থাকতেন, কাজ করতেন। আমাদের বাড়িতে আকাব্বর চাচা বলে একজন ছিলেন। কোন কোন বাড়িতে সে সময় নিয়ম ছিল হিন্দু বাড়ির ছায়া যতটা পর্যন্ত পড়বে তার মধ্যে কোন মুসলমান আসতে পারবে না। সে যদি জল খেতে চায় তাহলে তাকে বদ্না করে জল দেওয়া হবে। অর্থাৎ যাকে বলে অচ্ছুত করে রাখা। সেটা আমার বাড়িতে কিন্তু এই পর্যায়ে ছিল না। সেটা অবশ্য আমার ঠাকুমার প্রভাবে। আমরা আমাদের জাঠতুতো খুড়তুতো ভাইয়েরা বয়সের দিক থেকে যারা প্রায় কাছাকাছি ছিলাম তারা ছোট বেলায় খুব দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিলাম। এমন কোন অপকর্ম নেই যা ছোট বেলায় করিনি।

সুন্দরবনে মোরগ লড়াই

সুভাষ মিস্ত্রী

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে, ইন্দোনেশিয়ায়, জাপানে মোরগ লড়াই প্রচলিত। ভারতবর্ষে বিহার ও ছোটনাগপুর, কাশ্মীর, কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই হয়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, জলপাইগুড়ি, হাওড়া, হুগলী, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এমনকি সুন্দরবনেও। সুন্দরবনে জল, জঙ্গল, আর জনপদ তথা জীবনের অঙ্গ মোরগ লড়াই।

সুন্দরবনেও মোরগ লড়াই ছিল মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব খেলা। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, মাহাতো, বেদিয়া, হাঁড়ি প্রভৃতি প্রমোদে মাত্‌তো। ক্রমে পৌণ্ড, বাগ্দি, মাহিষ্য, কৈবর্ত্য, নমশূদ্র, রাজবংশী, গুঁড়ী, তিয়র, চামার, তঁইয়া প্রভৃতি তপশীলি জাতি ও মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে মোরগ লড়াই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সব স্তরের মানুষেরই এক ধরণের আদিম চিত্তবিনোদন। সুন্দরবনের বৃহত্তম সংখ্যক মানুষ যাঁরা আর্থসামাজিক মানদণ্ডে সবার পিছনে পড়ে আছেন, নিরক্ষর, অর্ধ স্বাক্ষর কিংবা স্বল্প স্বাক্ষর মানুষ, তাঁরাই এই প্রমোদমূলক অনুষ্ঠানটিকে জীইয়ে রেখেছেন।

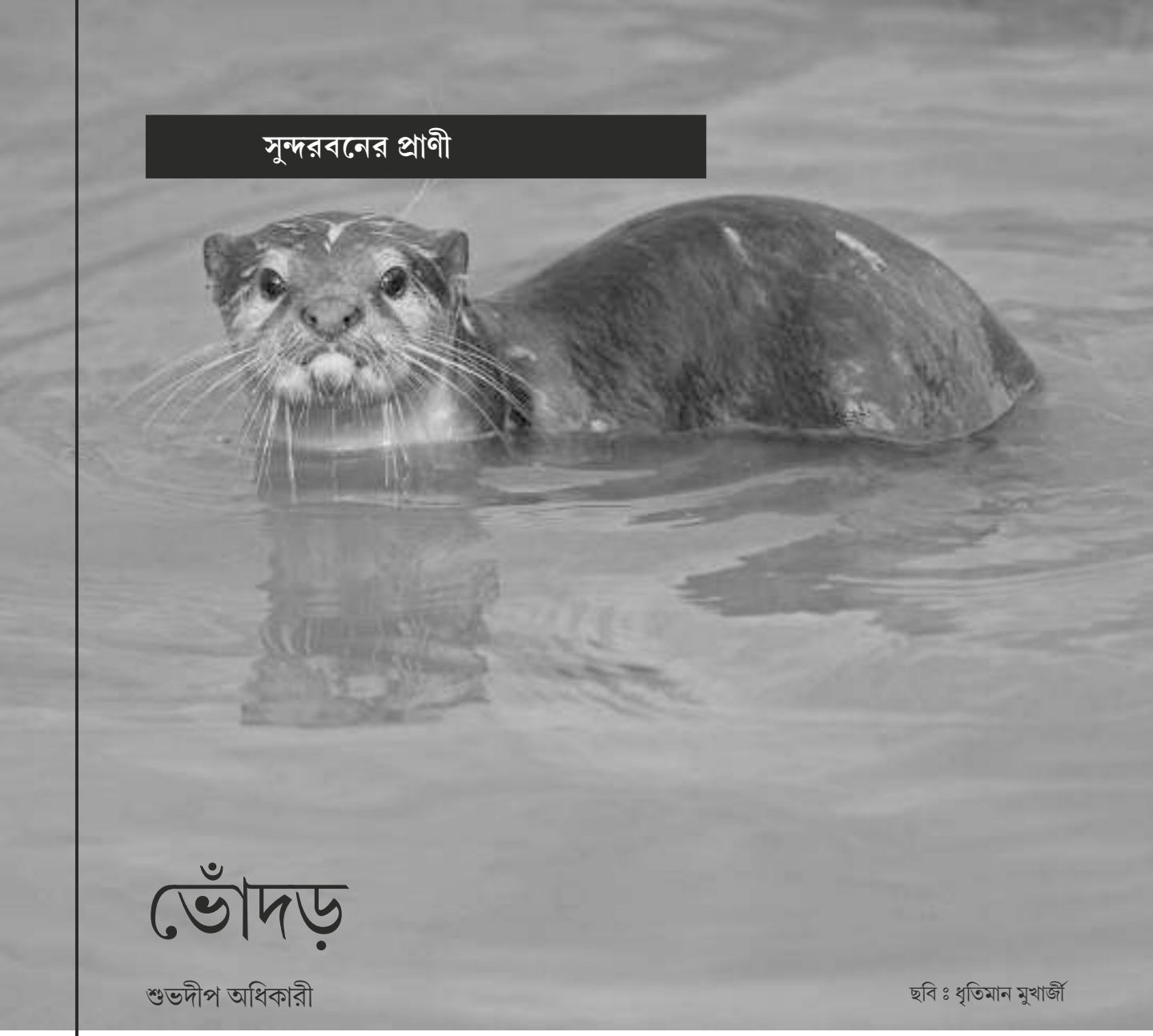

ভোঁদড়

শুভদীপ অধিকারী

ছবি ঃ ধৃতিমান মুখার্জী

ইংরাজি নাম - Smooth Coated Otter

বিজ্ঞানসম্মত নাম- *Lutrogale perspicillata*

কেমন দেখতে ঃ- মসৃণ ও তৈলাক্ত দেহ, জল রোধক। লোম এত চকচকে, মসৃণ ও ঘনভাবে থাকে বলে মনে যেন সারা দেহ পালিশ করা।

রঙ কালচে গাঢ় বাদামী থেকে লালচে বাদামী; মাঝে মাঝে হলদে বা কমলাটে বাদামী। গলা ও পেটের দিক একটু হালকা বর্ণের অর্থাৎ হালকা বাদামী বা প্রায় ধূসর। মাথা গোলাকার, ভোঁতা মুখ, কান ছোট। নাকের দুপাশে বড় বড় গোঁফ, যা স্পর্শেন্দ্রিয় হিসাবে কাজ করে। নাকের সামনে লোমহীন তুণ্ড (Snout) অংশটিতে ইংরাজি 'V' অক্ষরের মত খাঁজ কাটা থাকে। লেজ চ্যাপ্টা, অনেকটা দাঁড়ের মত।

মাথা ও ধড় মিলিয়ে দু'থেকে আড়াই ফুট (২৫-২৯ ইঞ্চি) এবং লেজ সমগ্র দেহের ৬০ শতাংশ অবধি হতে পারে (১৬-১৮ ইঞ্চি)। ওজন সাত থেকে এগারো কিলোর মধ্যে।

পা আকারে ছোট, মোটা, আঙুলগুলো চামড়া দিয়ে জোড়া অর্থাৎ লিপ্তপদ। এদের থাবা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নখ অত্যন্ত ধারালো।

জলে সাঁতার কাটার সুবিধার জন্য এদের পা ও লেজ -এর এই বিশেষ অভিযোজন দেখা যায়।

সুন্দরবন ঃ ঘটনাপঞ্জী

(১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০১০)

১৮.০৯.২০১০ লোকালয়ে বাঘ ঃ পাথর প্রতিমার অচিন্ত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শ্রীপতি নগরে ঠাকুরান নদীর চরে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান গ্রামবাসীরা।

১৯.০৯.২০১০ লোকালয়ে বাঘিনি ঃ কুমিরমারির হাটগ্রামে এক গৃহস্থের রান্নাঘরে ঢুকে আটকে পড়ে একটি বাঘিনি। বনকর্মীরা বাঘিনিটিকে খাঁচা বন্দী করে সজনেখালিতে নিয়ে যান। বাঘ বিশেষজ্ঞদের মতে এই সময় বাঘেদের প্রজনন ঋতু। এ সময় তারা সঙ্গী খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। ঝিলার জঙ্গল থেকে কোরানখালি নদী পার হয়ে বাঘিনিটি গ্রামে ঢোকে।

২০.০৯.২০১০ বাঘিনিকে জঙ্গলে ছাড়া হল ঃ কুমিরমারিতে ধরা পড়া বাঘিনিকে বাঘমারা জঙ্গলে ছাড়া হল বনকর্মীদের তত্ত্বাবধানে।

২০.০৯.২০১০ বিদ্যাধরীতে বাইচ প্রতিযোগিতা ঃ মিনাখাঁর বিদ্যাধরী নদীতে মনসা ও বিশ্বকর্মা প্রতিমার ভাসানকে কেন্দ্র করে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নদীর দুপাড়ে চৈতল ও মালঞ্চে ছয়-সাত হাজার দর্শক সমাগম হয়।

২১.০৯.২০১০ ফ্লাড সেন্টারের উদ্বোধন ঃ গোসাবার বালিদ্বীপের মথুরাখন্ডে ফ্লাড সেন্টারের শিলান্যাস করেন সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সচিব রাঘবেন্দ্র সিং। সেন্টার গড়ে তোলার জন্য টাটা রিলিফ সোসাইটির পক্ষে ৩০লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নেচার এনভায়রনমেন্ট অ্যাণ্ড ওয়াইল্ড লাইফ সোসাইটিকে।

২২.০৯.২০১০ কুমিরের মুখ থেকে রক্ষা ঃ পাথরপ্রতিমার কার্জন ক্রিক নদীতে চিংড়ির মীন ধরতে গিয়ে কুমিরের আক্রমণের মুখে পড়ে কপাল জোরে বেঁচে গেলেন সুশীল মাইতি। বেশ কিছুক্ষণ কুমির ও মানুষে টানাটানির পর অন্য সঙ্গীদের সাহায্যে রক্ষা পেলেন তিনি। তাঁর ডান পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২৩.০৯.২০১০ সুন্দরবনে নারীপাচার নিয়ে কর্মশালা ঃ দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আহ্বানে নারীপাচারের বিরুদ্ধে সুন্দরবন বাসন্তীর এন.জি.ও 'জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র'-এ একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

২৪.০৯.২০১০ ক্যানিংয়ে ডাকাতি ঃ ক্যানিংয়ে ট্রেন থেকে নেমে একদল যাত্রী ভাঁটার সময় হেঁটে মাতলা নদী পার হওয়ার সময় ৫-৬জনের ডাকাত দল আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যাত্রীদের ঘিরে ধরে এবং লুটপাট চালায়।

২৫.০৯.২০১০ ক্যানিংয়ে ডাকাতি ঃ ক্যানিং শহরের ধুমকাটি এলাকায় পরপর চারটি বাড়িতে ডাকাতি হয়।

২৬.০৯.২০১০ লোকালয়ে কুমির ঃ পাথর প্রতিমার জি প্লটের সত্যদাসপুরের পুকুরে একটি কুমির ঢুকে পড়ে। জগদ্দল নদী লাগোয়া একটি পানা পুকুরে কুমির ভেসে থাকতে দেখা যায়।

২৭.০৯.২০১০ মাতলা সেতু খুলে দেওয়া হল পথচারীদের জন্য ঃ ক্যানিং ও বাসন্তীর মধ্যে সেতুটি খুলে দেওয়া হল কোন রকম অনুষ্ঠান ছাড়াই। এখন সেতুতে কোন গাড়ি চলাচল করবে না। শুধুমাত্র পথচারীদের জন্য খোলা হল সেতুটি।

২৭.০৯.২০১০ কুমির ধরল বনদপ্তর ঃ পাথর প্রতিমার জি প্লটে ঢুকে পড়া কুমির ধরে ফেলল বনদপ্তর। কুমিরটি প্রায় ৬ফুট লম্বা।

২৮.০৯.২০১০ ম্যানগ্রোভ লাগানো হল ঃ আমতলি ও মনিপুরের মাঝে রায়মঙ্গল নদীর চরে প্রায় ৬৫ হাজার গাছ লাগানো হল। আনুষ্ঠানিক ভাবে এই উদ্যোগের সূচনা করেন সন্দেশখালি-২ পঞ্চায়েতে সমিতির সভাপতি স্বপ্না খন্ডিত।

২৯.০৯.২০১০ গাছের গুঁড়ি ঘিরে পূজো ঃ সন্দেশখালি এক নম্বর ব্লকের বয়ারমারি দুনম্বর অঞ্চলের কানমারি দলুই পাড়ায় একটি কাটা ডুমুর গাছের গোড়া থেকে লাল রঙের জলীয় পদার্থ বের হতে থাকে। গুজব রটে মা মনসার আবির্ভাবের। প্রচুর গ্রামবাসী ভিড় করেন পূজো দিতে।

০১.১০.২০১০ সুন্দরবন নিয়ে তথ্যচিত্র ঃ সুন্দরবন অধিকার ও জনক্যলাণ সমিতি আইলা পরবর্তী সুন্দরবনবাসীদের সমাজচিত্র তুলে ধরতে একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করল। তথ্যচিত্রটির নাম বাঘ রাজ্যের না- মানুষের কথা।

০৪.১০.২০১০ সাপের কামড়ে মৃত্যু ঃ দক্ষিণ ২৪পরগণার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত গৌজবেড়িয়া গ্রামে চতুরানন কয়াল (৭৭) নামে এক ব্যক্তির সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়।

০৪.১০.২০১০ সাপের কামড়ে মৃত্যু ঃ জীবনতলা থানার পাড়িখালিতে সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় সাগরি সর্দার (৫২) এর।

০৬.১০.২০১০ ট্রলার থেকে পড়ে মৃত্যু ঃ কাকদ্বীপে মায়নাপাড়া নদীতে ট্রলার থেকে পড়ে মৃত্যু হল পুরঞ্জয় বাগ (৫২) নামে এক মৎস জীবির।

০৭.১০.২০১০ কোটালের জলে বাঁধ ভাঙল ঃ কোটালের জলে ক্ষতিগ্রস্ত হল সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা, সাগর ও কাকদ্বীপ ব্লক। লক্ষ্মী জনার্দনপুর ও ব্রজবল্লভপুর পঞ্চায়েতের কেদারপুর, পাত্রেরটেকা, সামন্তেরঘাট, দক্ষিণ ব্রজবল্লভপুর, ক্ষেত্রমোহনপুর, মুসলিমপাড়ায় প্রায় ৫০ফুটের বেশি বাঁধ ভেঙে গেছে। সাগরের বোটখালি এলাকায় বঙ্গোপসাগরের ভাঙা বাঁধ দিয়ে কোটালের জল ঢুকেছে।

১২.১০.২০১০ রহমতুল্লার ব্রোঞ্জ ঃ কমনওয়েলথ গেমস্-এ রিলে রেসে ব্রোঞ্জ পেলেন রহমতুল্লা। তিনি মথুরাপুরের কৃষ্ণচন্দ্ররপুরে কাছে অবস্থিত ডাকাইতমারি গ্রামের বাসিন্দা।

১৪.১০.২০১০ ঝড়বৃষ্টিতে গৃহহীন ঃ নামখানার ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েতের অমরাবতী, বিজয়বাটি, শিবপুর গ্রামে প্রবল ঝড়ে প্রায় একশ জন গৃহহীন হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলি বঙ্গোপসাগরের কাছেই অবস্থিত।